সংবাদ

তারিখ 7 SEP 2009
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৫

সকল প্রকার বৈষম্য অপনোদনের ক্ষেত্রে শিক্ষা হচ্ছে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী চালিকা শক্তি। নিবিড় অন্ধকার ভেদ করে একমাত্র শিক্ষার আলোই নারীকে তার অধিকার আদায়ের শক্তি যোগাতে পারে। জীবন সংগ্রামে টিকে থাকার জন্য শিক্ষার ভূমিকাকে অস্বীকার করার উপায় নেই। কারণ শিক্ষা মানবজীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য ও অপরিহার্য অঙ্গ। এখানে শিক্ষা শব্দটি একটু ব্যাখ্যা করে বলা প্রয়োজন।

প্রস্তাবিত সকল শিক্ষানীতিতে নারী শিক্ষার কথা অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। কেননা নারী শিক্ষা ব্যতিত কোন ক্রমেই আমাদের উন্নতি সম্ভব নয়। বিশ্বের সব দেশই শিক্ষার সুদূর প্রসারি ভূমিকা সম্পর্কে সচেতন। উল্লিখিত কারণে বলা যায়, সামগ্রিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন সম্ভব সকলের সমান শিক্ষার মাধ্যমে।

শিক্ষার মর্মকথা হলো– দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলা। শিক্ষা কেবল মাত্র অক্ষর-জ্ঞান প্রদানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। একটু পড়তে পারা, নাম সই করতে পারার মধ্যে 'শিক্ষা' শব্দটিকে সীমাবদ্ধ রাখলে সে শিক্ষা দ্বারা মহৎ কিছু অর্জন করা সম্ভব নয়। অথচ বাংলাদেশে সাক্ষরতা অর্থে এ ধরনের শিক্ষাকেই বোঝানো হয়ে থাকে। ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে নারীর স্থিতিকে সুদৃঢ় করতে হলে যে শিক্ষার প্রয়োজন, সে শিক্ষাকে ব্যাপ্ত হতে হবে আরও ব্যাপকভাবে। নারী শিক্ষা বলতে আমরা এমন শিক্ষাকে বোঝাবো, যে শিক্ষা নারী তার মেধা, দক্ষতা, যোগ্যতা, পছন্দ ও ইচ্ছা অনুযায়ী গ্রহণ করবে। পুরুষের সঙ্গে যোগ্যতা ও সমতার ভিত্তিতে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় সমানভাবে এগিয়ে যাবে। নিজ যোগ্যতার সফল প্রমাণের মধ্য দিয়ে ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হবে। নারী শিক্ষা কেবল নারীর জন্য প্রয়োজন তা নয়, জাতির অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার জন্যও নারীকে শিক্ষিত হতে হবে। আজকের বিশ্বায়নের যুগে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি এবং সুনাম ও সম্মান অক্ষুণ্ন রাখার জন্য নারী শিক্ষার অপরিসীম গুরুত্বকে কোনমতেই উপেক্ষা করা যায় না।

নারীশিক্ষা কেবল নারীর অস্তিত্ব সুপ্রাচীন। ইতিহাস থেকে জানা যায়, প্রাচীন বৈদিক ও বৌদ্ধ যুগেও এদেশে নারী শিক্ষার প্রচলন ছিল। মুহম্মদ বিন কাসিমের সিন্ধু বিজয়ের মধ্য দিয়ে ভারত উপমহাদেশে মুসলিম চিন্তা ও সভ্যতার দ্বারোদঘাটন হয়। এ সময় নারীশিক্ষার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেয়া হয়। যদিও মেয়েদের লেখাপড়ার জন্য পৃথক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল, তথাপি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মেয়েরা নিজ ঘরে অথবা শিক্ষকের ঘরে গিয়ে লেখাপড়া করত। নারীশিক্ষা যুগে যুগে, ধাপে ধাপে চলে এসেছে বিভিন্নভাবে, থেমে থাকেনি। নারীর এ শিক্ষা কার্যক্রম অনন্ত কাল ধরে চলেছে, চলবে। উপযুক্ত শিক্ষা কার্যক্রম ছাড়া কোনক্রমেই সঠিক শিক্ষা ও তত্ত্বাবধান সম্ভব নয়। বাংলার স্বাধীন সুলতানদের আমলে নারীশিক্ষার যে প্রসার ঘটে, মুঘল আমলে তা আরও অধিক দূর পর্যন্ত প্রসারিত হয়। এ সময় রাজ পরিবার এবং সম্ভ্রান্ত ও উচ্চ পরিবারের মেয়েদের জন্য অন্তঃপুরে মাদ্রাসা স্থাপন করা হয়। মুঘল রাজ পরিবারের মেয়েরা শিক্ষার ক্ষেত্রে যথেষ্ট অবদান রেখে গেছেন। এ সময় আমরা 'হুমায়ুননামা' রচয়িত্রী বাবরের কন্যা গুলবদন বেগম এবং নূরজাহান, মমতাজ মহল, জাহানারা বেগম ও জেবুন্নেসা প্রমুখ বিদুষী মহিলার সাক্ষাৎ পাই। ঐ যুগের নারী শিক্ষার বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনা করলে যে সত্যটি প্রতিভাত হয়ে উঠে সেটি হল, নারী শিক্ষা এ সময়ে সাহিত্য ও কাব্যচর্চা এবং আরবি ও ফারসি ভাষা শিক্ষা লাভের মধ্যে অধিকতর সীমাবদ্ধ ছিল। এতে বেশি সীমাবদ্ধতার মাঝেও শিক্ষাগ্রহণে অনেকেই মনোযোগী ছিল। শিক্ষা গ্রহণও করেছিল। শিক্ষাগ্রহণে নারীর এ তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা সময়ের বিবর্তনে ধারাবাহিকভাবে চলে এসেছে। কালের আবর্তে এটি প্রসারিত হয়েছে এবং কার্যক্রম গতিশীল হয়েছে।

ব্রিটিশরাও বিভিন্নভাবে শিক্ষা সম্প্রসারণে উদ্যোগী হয়েছিল; কিন্তু সেটির উদ্দেশ্য মহৎ ছিল না, ছিল আগাগোড়া ইংরেজ তৈরি করা। ফলে তারা চেয়েছে ইংরেজি শিক্ষার প্রতি অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করতে। দীর্ঘদিন যাবত আমাদের দেশের নারী শিক্ষার এ দুরবস্থায় সরকারের সুদূরপ্রসারি ও মুখ্য ভূমিকা একান্ত আবশ্যক বলে মনে করি।

ইসলামে নারী শিক্ষার ওপর গুরুত্ব ভাষিদ দিয়েছেন।

পাকিস্তান শাসন আমলে নারী শিক্ষা

পাকিস্তান আমলে নারীশিক্ষার বিষয়ে কয়েকটি সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল। নারীদের মর্যাদা রক্ষায় সে সময় বিভিন্নভাবে সরকার চেষ্টা করেছিল। আকরাম খান কমিশন নারীশিক্ষার ব্যাপারে মূল্যবান সুপারিশ রেখেছিল। আকরাম খান কমিশনের প্রথম সুপারিশ ছিল এগার বছর বয়স পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দানের দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে মহিলা শিক্ষকের ওপর ন্যস্ত করতে হবে। এ উদ্দেশ্যে কমিশন মহিলা শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ওপর সবিশেষ গুরুত্বারোপ করে। আকরাম খান কমিশনের একটি উল্লেখযোগ্য সুপারিশ ছিল মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা স্তরে মেয়েদের সংখ্যা বৃদ্ধিকল্পে পুরুষদের উৎসাহিত এবং উদ্বুদ্ধকরণ। সেকালের প্রেক্ষাপটে নিঃসন্দেহে এটিকে একটি বিশেষ উদ্যোগ বলা যেতে পারে। কমিশনের মতে, পুরুষদের সহযোগিতা ব্যতিরেকে নারীশিক্ষা সম্পর্কিত যে কোন কর্মসূচি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে বাধ্য। পুরুষদের উৎসাহিত করার লক্ষ্যে শিক্ষক-অভিভাবক সভা এবং প্রচার মাধ্যমে বহুল ব্যবহারের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। মেয়েদের জন্য ফ্রি স্টুডেন্টশিপ, বিনামূল্যে বইপত্র, ফ্রি স্কুল ড্রেস, ফ্রি টিফিন, ফ্রি চিকিৎসা এবং দু'মাইলের অধিক দূর থেকে আগত ছাত্রীদের জন্য ফ্রি যাতায়াত ভাতার সুপারিশ করা হয়। মহিলা শিক্ষিকাদের জন্য স্কুলের নিকটবর্তী ফ্রি আসবাসপত্রসহ আবাসন এবং যথোপযুক্ত বেতন প্রদানের সুপারিশ করা হয়।

আকরাম খান কমিশনের সুপারিশগুলো নিঃসন্দেহে অত্যন্ত বাস্তবসম্মত ও আধুনিক প্রতীয়মান হলেও দুর্ভাগ্য এই যে, সুপারিশগুলো বাস্তবায়িত হয়নি। যথাসময়ে সুপারিশগুলো বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশে মেয়েদের শিক্ষা আজ আরও অনেক দূর পর্যন্ত এগিয়ে যেত। আকরাম খান কমিশন রিপোর্টই সর্বপ্রথম নারীশিক্ষার সহকারী পরিচালকের পদ সৃষ্টির কথা বলা হয়। কমিশন আরও সুপারিশ করে যে, পূর্ব পাকিস্তানের প্রত্যেক জেলায় মহিলা শিক্ষা অফিসার থাকতে হবে।

(চলবে)

[সাক্ষরতা বুলেটিন, শ্রাবণ ১৪১৬, জুলাই ২০০৯]